**[জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)](http://uttarannews.net/site2/?article=%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%98%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a6%87-%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%9f%e0%a6%a8-%e0%a6%b2-2)**

জাতিসংঘ সারাবিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ১৭টি লক্ষ্য (এসডিজি) নির্ধারণ করেছে। প্রতিটির ক্ষেত্রে রয়েছে আবার একাধিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। উত্তরণের গত সংখ্যায় লক্ষ্য ১ ও ২ তুলে ধরা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার তৃতীয় ও চতুর্থ লক্ষ্য হচ্ছেÑ স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিত করে সব বয়সী মানুষের জন্য সমৃদ্ধ জীবনের প্রণোদনা প্রদান এবং সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে ন্যায্য ও মানসম্মত শিক্ষা এবং সবার জন্য আজীবন শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা। এ সম্পর্কে এবারের আলোচনা।  
সব বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ ও কল্যাণময় জীবনে উত্তরণ  
সবার জন্য ও সব বয়সের মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা টেকসই উন্নয়নের জন্য জরুরি। উল্লেখ করার মতো কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা গড় আয়ুষ্কাল বাড়িয়েছে এবং মা ও শিশুদের কিছু কিছু ঘাতক রোগের প্রকোপ কমিয়েছে। উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সফলতা রয়েছে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের বৃদ্ধিতে, পয়ঃনিষ্কাশনসহ ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, পোলিও এবং এইচআইভি/এইডসের মতো রোগের বিস্তার প্রতিরোধে। অনেক ধরনেরই প্রচেষ্টার প্রয়োজন পড়বে নানা ধরনের রোগ-ব্যাধির মূলোৎপাটন করতে এবং অনেক জটিল ও নতুন নতুন আবির্ভাব হওয়া রোগ মোকাবিলার জন্য।  
বর্তমান স্বাস্থ্যচিত্র  
শিশুস্বাস্থ্য  
 শিশুমৃত্যু ১৯৯০ সালের তুলনায় প্রতিদিন ১৭ হাজার কম হলেও এখনও প্রতিবছর ৬০ লাখ শিশু ছয় বছর বয়সের আগেই মৃত্যুবরণ করছে।♣  
 ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি হামের টিকা প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি ৫৬ লাখ শিশুর জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।♣  
 সুনির্দিষ্ট বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা সত্ত্বেও সাব-সাহারা ও দক্ষিণ এশিয়ায়♣ শিশুমৃত্যুর হার ঊর্র্ধ্বগামী। পাঁচ বছরের নিচে বিশ্বের প্রতি পাঁচ শিশুর মধ্যে চার শিশু এই অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করে।  
 স্বচ্ছল পরিবারের তুলনায় দরিদ্র পরিবারের পাঁচ বছরের নিচের শিশুমৃত্যুর সম্ভাবনা দ্বিগুণ।♣  
 নিরক্ষর মায়ের শিশুর তুলনায় শিক্ষিত এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষিত মায়ের শিশুর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি।♣

মাতৃস্বাস্থ্য  
 ১৯৯০ সাল থেকে মাতৃমৃত্যুর হার প্রায় ৫০ শতাংশে নেমে এসেছে।♣  
 পূর্ব এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় মাতৃমৃত্যু প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কমে এসেছে।♣  
 কিন্তু মাতৃমৃত্যুর হারÑ প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুর হার উন্নত বিশ্বের তুলনায় উন্নয়নশীল বিশ্বে এখনও ১৪ গুণ বেশি।♣  
 বর্তমানে অধিক সংখ্যক মা প্রসবপূর্ব সেবা পাচ্ছেন। উন্নয়নশীল অঞ্চলে ১৯৯০♣ সালের প্রসবপূর্ব সেবা ৬৫ শতাংশ থেকে ২০১২ সালে ৮৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।  
 উন্নয়নশীল অঞ্চলে কেবল অর্ধেক নারী প্রয়োজনে তাদের জন্য অনুমোদিত স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন।♣  
  অধিকাংশ উন্নয়নশীল অঞ্চলে কিশোরীদের মা হওয়ার প্রবণতা কমেছে; কিন্তু এই♣ কমার গতি ধীর। ১৯৯০ দশক থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির সাথে ২০০০ দশকের সাথে মিল নেই।  
 অধিক সংখ্যক নারীর জন্য পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হচ্ছে ধীরগতিতে; কিন্তু এর চাহিদা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।♣

এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ্য  
 ২০১৪ সালের শেষে ১ কোটি ৩৬ লাখ মানুষ এন্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপির আওতায় এসেছে।♣  
 ২০১৩ সালে ২১ লাখ নতুন এইচআইভিতে সংক্রামিত হয়েছে, যা ২০০১ সালের তুলনায় ৩৮ শতাংশ কম।♣  
 ২০১৩ সালের শেষে ৩ কোটি ৫০ লাখ এইচআইভি রোগে আক্রান্ত হয়ে বেঁচে আছে, যার মধ্যে ২১ লাখ কিশোর-কিশোরী।♣  
 ২০১৩ শেষে ২ লাখ ৪০ হাজার শিশু নতুনভাবে এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছে।♣  
 ২০০১ হতে ঘোষিত নতুনভাবে এইচআইভিতে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা ৫৮ শতাংশ।♣  
 বিশ্বব্যাপী কিশোরী এবং যুবা নারীরা লিঙ্গভিত্তিক অসমতা, বঞ্চিতকরণ,♣ পক্ষপাতিত্ব এবং সন্ত্রাসের স্বীকার। যা তাদের এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকিতে ফেলছে।  
 বিশ্বব্যাপী প্রজননক্ষম মেয়েদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ এইচআইভি।♣  
 এইচআইভি সংক্রামিত যক্ষ্মা রোগীর মৃত্যুর হার ২০০৪ সাল হতে ৩৬ শতাংশ কমেছে।♣  
 ২০১৩-তে নতুনভাবে এইচআইভিতে আক্রান্ত ২ লাখ ৫০ হাজার কিশোর-কিশোরীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই ছিল কিশোরী।♣  
 আফ্রিকা মহাদেশের ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সের কিশোর-কিশোরীদের মৃত্যুর প্রধান♣ কারণ এইডস এবং সারাবিশ্বে কিশোর-কিশোরীদের মৃত্যুর এটা দ্বিতীয় প্রধান কারণ।  
 বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে কিশোরীর গোপনীয়তা এবং নিজ শারীরের♣ স্বাধীনতাকে সম্মান করা হয় না। এ ছাড়া অনেক কিশোরী অভিযোগ করেছে, তাদের প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা জোরপূর্বক হয়েছে।  
 ২০১৩-তে এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা ছিল ২১ লাখ।♣  
 ২০০০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৬২ লাখেরও অধিক (যার অধিকাংশ সাব-সাহারা♣ আফ্রিকার) পাঁচ বছরের নিচের শিশু ম্যালেরিয়া রোগের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী ম্যালেরিয়া আক্রান্তের হার কমেছে আনুমানিক ৩৭ শতাংশ এবং মৃত্যু হার কমেছে ৫৮ শতাংশ।  
 ২০০০ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে যক্ষ্মার প্রতিরোধ, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসার♣ মাধ্যমে আনুমানিক ৩ কোটি ৭০ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা পেয়েছে। ১৯৯০ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে এই রোগে মৃত্যু হার কমেছে ৪৫ শতাংশ এবং রোগাক্রান্তের হার কমেছে ৪১ শতাংশ।

কাক্সিক্ষত লক্ষ্যসমূহ  
 ২০৩০ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার ৭০-এ নামিয়ে আনা (প্রতিলাখে)।♣  
 ২০৩০ সালের মধ্যে সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুমৃত্যুর হার প্রতিহাজারে ১২ ও পাঁচ♣ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার প্রতিহাজারে ২৫-এ নামিয়ে আনা।  
 ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়ার পাশাপাশি অবহেলিত উষ্ণম-লীয়♣ রোগ, হেপাটাইটিস, পানিবাহিত ও অন্যান্য ছোঁয়াচে রোগমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা।  
 ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার মাধ্যমে এবং মানসিক♣ স্বাস্থ্যসেবা ও জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনা।  
 মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে মাদকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসাব্যবস্থা জোরদার করা।♣  
 ২০২০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও আহতের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা।♣  
 ২০৩০ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনাসহ সবার জন্য যৌন ও প্রজনন♣ স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করা। প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাকে জাতীয় কৌশল ও কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।  
 বিশ্বব্যাপী সবার জন্য উন্নত চিকিৎসা, ওষুধের সরবরাহসহ সার্বজনীন♣ চিকিৎসাব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ২০৩০ সালের মধ্যে বায়ু, পানি, মাটিসহ পরিবেশ দূষণজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা।  
 ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাঠামো অনুযায়ী বিশ্বের সব দেশে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা।♣  
 বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক তৈরিতে গবেষণা কার্যক্রমে সাহায্য-সহযোগিতা♣ বাড়ানো। ট্রিপস চুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণের জন্য ওষুধ ও প্রতিষেধক প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।  
 সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ যেগুলো উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত♣ করে এ রকমের বিস্তার রোধে ঔষধ ও টিকা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য সহায়তা করা। সহায়তা সম্প্রসারণ করা, যা কার্যকর জরুরি ঔষধ, এবং টিকা যা ট্রিপস চুক্তি ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক দোহা ঘোষণা অনুসারে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ও জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, যা সবার জন্য ঔষধ ও সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকারকে বোঝায়, যা ট্রিপস ও মেধাস্বত্ব আইনে বর্ণিত রয়েছে।  
 স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে অর্থায়ন বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ। উন্নয়নশীল,♣ বিশেষ করে স্বল্পোন্নত ও ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর স্বাস্থ্য খাতের মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ।  
 উন্নয়নশীল দেশগুলোসহ বিশ্বের সব দেশের স্বাস্থ্যবিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঝুঁকি মোকাবিলার সামর্থ্য বাড়ানো।♣

সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে ন্যায্য ও মানসম্মত শিক্ষা এবং আজীবন শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা  
মানসম্মত শিক্ষা অর্জন মানুষের জীবনের মান ও টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি। সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধিতে বিশেষ করে নারী ও মেয়ে শিশুর স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সাক্ষর জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে; তবুও এখনও সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরও অনেক সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পৃথিবীর সর্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে ও মেয়ের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে; কিন্তু এমন দেশ খুব কমই আছে যেখানে শিক্ষার সর্বস্তরে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয়সমূহ  
 উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার ৯১ শতাংশে পৌঁছেছে কিন্তু এখনও ৫৭ মিলিয়ন শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।♣  
 যেসব শিশু স্কুলে ভর্তি হয়নি তাদের অর্ধেকেরও বেশি সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলের♣ বাসিন্দা।  
 প্রায় ৫০ শতাংশ শিশু যাদের স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়েছে; কিন্তু স্কুলে যায় না, তারা যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় বসবাস করে।♣  
 সারাবিশ্বে ১০৩ মিলিয়ন তরুণ সাক্ষর জ্ঞানহীন, যার প্রায় ৬০ শতাংশের বেশি নারী।♣  
লক্ষ্য ৪-এর অধীনে টার্গেটসমূহ  
 ২০৩০ সালের মধ্যে সব ছেলেমেয়ের জন্য সম্পূর্ণ অবৈতনিক, যথার্থ ও মানসম্মত♣ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, যা লক্ষ্য ৪-এর উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে।  
 ২০৩০ সালের মধ্যে সব ছেলেমেয়ের জন্য মানসম্মত প্রাক-শিশু বিকাশ ও যতœ এবং♣ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, যাতে তারা স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে পারে।  
 ২০৩০ সালের মধ্যে সব নারী-পুরুষের জন্য স্বল্পমূল্যে মানসম্মত কারিগরি,♣ বৃত্তিমূলক ও একাডেমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ।  
 ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্পন্ন চাকরি ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয়♣ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ সব ধরনের দক্ষতা আছে, এমন তরুণ ও প্রাপ্ত বয়স্কের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি।  
 ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং প্রতিবন্ধী,♣ আদিবাসী ও যেসব শিশু ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে তাদের সহ সব ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষার সব স্তর ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে সমান অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ।  
 ২০৩০ সালের মধ্যে সব তরুণ-তরুণী ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী-পুরুষ যেন স্বাক্ষর করতে পারে ও সাধারণ গণনা করতে পারে তা নিশ্চিত করা।♣  
 ২০৩০ সালের মধ্যে সবাই টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা যেন♣ অর্জন করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন, টেকসই জীবনধারা, মানবাধিকার, জেন্ডার সমতা, শান্তি ও অহিংসার সংস্কৃতি, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির অবদান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও প্রচারের মাধ্যমে এই জ্ঞান অর্জন সম্ভব।  
 এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে, যা শিশু, প্রতিবন্ধিতা ও জেন্ডার♣ সেনসেটিভ বিষয়গুলোকে লক্ষ রেখে প্রণয়ন করা হবে এবং সবার জন্য নিরাপদ, বিপদমুক্ত ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করবে।  
 ২০২০ সালের মধ্যে উন্নত দেশসমূহে উচ্চ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক♣ শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ, প্রকৌশল এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশ, স্বল্পোন্নত দেশ, ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্র এবং আফ্রিকান দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য উল্লেখযোগ্য হারে বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।  
 ২০৩০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নশীল,♣ স্বল্পোন্নত ও ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রসমূহের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়াতে হবে।

লেখক : সহ-সাধারণ সম্পাদক, সাসটেইনবল ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ (এসডিএনবি)  
ই-মেইল : razib.pervez@gmail.com